৩) অবশিল্পায়ন কী একটি অতিকথা? / তুমি কী মনে কর যে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে অবশিল্পায়ন ঘটেছিল?

২) ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম বিষবৃক্ষ ফল হল এদেশের চিরাচরিত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটিরশিল্প বা হস্তশিল্প গুলির ধ্বংসসাধন। অর্থনৈতিক ইতিহাসের পরিভাষায় অবশিল্পায়ন (di-Industrialization) এর সূদূর প্রসারী ফল হিসাবে ভারত ক্রমশ শিল্পজাত পণ্যের বাজারে পরিনত হয়। অন্যদিকে ভারতবর্ষ ক্রমশ বিদেশবিশেষত ইংল্যাণ্ডের শিল্পে কাঁচামাল রপ্তানি পরিনত।

অবশিল্পায়নের ফলে ভারতের হাজার হাজার শিল্পী ও কারিগর তাদের চিরাচরিত পেশা ছেড়ে চাষবাসকে পেশা হিসাবে গ্রহন করতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং এদেশের অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নৌরজি, রানাডে প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতা ভারতের এই অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রবল সমালোচনা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে এই সময়ে ভারতবর্ষে যদি কোন স্বদেশী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন তাহলে এইভাবে অবশিল্পায়ন ঘটতো না। সরকার নিশ্চই শুল্ক সংরক্ষণ নীতি অনুসরন করে ভারতীয় শিল্পকে বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। সাম্রাজ্যবাদী সরকার তা করেনি।

অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র ভারতের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি ছিল দেশ জুড়ে। এই বস্ত্রশিল্পের রপ্তানি করে ভারত কোটিকোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, বাংলার মসলিন- রোম,

, রেশম চিনি ... ভারতবর্ষ থেকে এইসব দ্রব্য কেনার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে ছিল। এই সূত্র ধরেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এদেশের শাসক সম্প্রদায় ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির স্বার্থে বিদেশী বণিকদের আশ্রয় এবং সাহায্য দিতেন। এই সব বণিক গোষ্ঠীর অন্যতম ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

1757 সালে কোম্পানি যখন বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে তখন এদেশ থেকে প্রচুর বস্ত্র ইংল্যান্ডে যেত, এবং ইংল্যান্ড থেকে সেগুলি আবার অন্যান্য দেশে চালান যেত। 1765 সালে দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি বাণিজ্যের আরো প্রসার ঘটে। কোম্পানি ক্রমশ যেসব স্থানে অধিক বস্ত্র উৎপাদন হত, যেমন — ঢাকা, কাশিমবাজার, শান্তিপুর হুগলি প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং সেইসব কুঠিতে (ম্যানেজার ও বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করে ম্যানেজারের বিভিন্ন স্থানীয়) এজেন্টের মাধ্যমে তাঁতীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাদেরকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করে। এই দাদন প্রদানের মাধ্যমে তাঁতীদের কাছ থেকে যে চুক্তিপত্র আদায় করা হত তারফলে তাঁতীদের আর কোনো স্বাধীনতা থাকতো না। কোম্পানির লক্ষ্য ছিল তাঁতীদের কাছ থেকে যতটা পারা যায় কম দামে বস্ত্র কিনে তা থেকে অধিক মুনাফা আদায় করা এর ফলে তাঁতীদের ব্যাপক লোকসান হত থাকে তাদের অনেকেই ~~ব্যবস্থা~~ ব্যবসা পরিত্যাগ করে অন্যান্য পেশায় চলে যায়।

মূলত যে কারণে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ তা হল অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের বিকাশ। 1778 থেকে 1786 সালের মধ্যে একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর এনে দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ বিপুল বৃদ্ধি পায়। শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আমূল পরিবর্তিত হয়। এতদিন ভারত ছিল বস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ কিন্তু বর্তমান ইংল্যান্ডের বস্ত্র শিল্পের মালিকেরা চাইছিলেন ভারতের বাজার তাদের শিল্পজাত বস্ত্রের জন্য খুলে দেওয়া হোক।

1813 সালে কোম্পানি একচেটিয়া অধিকারের অবসান এবং ফলে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবে পুরো প্রভাব ভারতের উপর এসে পড়ে। এদেশের বাণিজ্যের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ইংল্যান্ডের তৈরি জিনিসে ভারতের বাজার ছেয়ে যায়। ইংল্যান্ডের জিনিস সস্তা সুন্দর এবং অবাধে এদেশের বাজারে প্রবেশ করতে পারে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পণ্যের উপর আমদানি শুল্ক অত্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রিটিশ পণ্যের উপর 2.5% হার শুল্ক কমিয়ে অন্যদিকে ভারতীয় পণ্যের উপর অত্যন্ত চড়া হারে রপ্তানি শুল্ক বসানো হয়। যেমনভাবে ~~1797~~ দশকের মত ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর উপর 10% আর ব্রিটিশ আমদানির উপর 2% শুল্ক 1797 সালের আগে সুতি বস্ত্র ও উপর শুল্ক ছিল 1.8%। 1800 সালে তা বেড়ে হয় 30% এবং 1823 সালে হয় $37\frac{1}{2}$%। সাধারণ সাদা কাপড় (মসলিন) 1797 সালে শুল্ক ছিল 40%,

১৮২৩ সালে এই পরিমান বৃদ্ধি করে হয় 67.5% ।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 13 শতকের গোড়া থেকে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও অন্যান্য শিল্প বিপন্ন হয়ে পড়েছিল এবং ধ্বংসের মুখে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী লেখক অভিযোগ করেছেন যে, ভারতবর্ষ যদি বিদেশী শাসনের পদানত না হত তাহলে হয়ত অবশিল্পায়নের মত এই দুর্যোগ দেখা দিত না। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই ভারতীয় বস্ত্রের উপর রপ্তানির উপর 10% আর ব্রিটিশ রমেশচন্দ্রের এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। শুল্কের আমদানির উপর হার বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের কারন। অভ্যন্তরীন দেশের বাজারকে রক্ষা করা দূরে থাক, তাকে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে ধ্বংস করে ব্রিটিশ শিল্পায়নের ভারতীয় শিল্পকে বলি দেওয়া হয়েছিল। বৈদেশিক বানিজ্যে হাতছাড়া হয়ে গেলেও যদি অভ্যন্তরীণ বাজার টিকে থাকত তা হলে হয়ত এ ভারতীয় শিল্প বেঁচে যেত। কিন্তু ব্রিটিশদের স্বার্থপর নীতির ফলে অভ্যন্তরীন বাজারও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দাদাভাই নৌরজি এবং রমেশচন্দ্র দত্ত এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দাদাভাই নৌরজি Poverty of un-British Rule in India গ্রন্থে দেখিয়েছেন নিজের মাতৃভূমিতে ব্রিটিশ জাতি যে নীতি অনুসরন করত ভারতবর্ষে তাদের নীতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

কিন্তু অমলেন্দু ত্রিপাঠী দেখিয়েছেন যে, অবশিল্পায়নের তত্ত্ব সম্পূর্ণ সঠিক নয়। তাঁর মতে আলোচ্য সময়কালে ভারতবর্ষে তাঁতশিল্প কিছুটা অবক্ষয়িত হলেও নীল, চিনি, সোরা প্রভৃতি শিল্প লাভবান হয়েছিল। প্রখ্যাত মার্কিন গবেষক মরিস ডি মরিস। মরিস মনে করেন যে, অবশিল্পায়ন একটি 'Mith' বা 'অতিকথা মাত্র'। তাঁর মতে জাতীয় ঐতিহাসিকেরা বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে জাতীয়তাবাদী লেখকেরা এদেশে শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বৃদ্ধিকেই অবশিল্পায়ন বলে ভুল করেছেন। যদি জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে, ভারতের মত আমদানি বৃদ্ধি পেলেও দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কিন্তু অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মনে করেন যে মরিসের যুক্তির তাৎপর্যে গলদ রয়েছে। তাঁর ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতির গ্রন্থে সব্যসাচী ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে, এদেশে জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশীয় শিল্প গুলি টিকে থাকেনি। দেশীয় শিল্পের টিকে থাকার কারণ ছিল আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়েও জাত ব্যবসায় টিকে থাকার ঝোঁক এবং সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল মহাজনের পদতলে কুটির শিল্পের পরাধীনতা।